অলৌকিক প্রহর
নাফে মোহাম্মদ এনাম

ভূমিকা

হরর অথবা থ্রিলার, এই দু'টি বিষয়ের উপর আমার দুর্বলতা সীমাহীন- হয়তো জন্মগতভাবেই। একটা সময় ছিল যখন আম্মুর কোলে-পিঠে চড়ে ঘুমাতাম। আম্মু আমাকে ঘুম পাড়াতেন ভূতের গল্প বলে কিংবা ভূতের ভয় দেখিয়ে। 'ভূত' শব্দটা কানে এলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত হাড্ডিসাড় কংঙ্কালের প্রতিচ্ছবি। অক্ষরজ্ঞানী হওয়ার পর ভেবেছিলাম আমাদের মত পিচ্চি শয়তানদেরকে জব্দ করার জন্যই ভূতের সৃষ্টি। বাচ্চাদের নিয়ন্ত্রণে রাখাই এর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এখন ভাবছি- ধারণাটা সত্যি ছিল ঠিকই তবে ভুল ছিল। কেননা পিচ্চি বয়সটা পেরিয়ে আসার পরই যদি ভূতের সমাপ্তি ঘটত তাহলে এর পরবর্তী সংস্করণ অশরীরী, প্রেতাত্মা বা পিশাচের আবির্ভাব ঘটল কিভাবে? তো, ভূত বলুন আর প্রেতাত্মাই বলুন এসব যে সর্বজন স্বীকৃত তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই আমার কথাই ধরুন- হরর সাতিত্যের জগতে আমি নিজেকে শীর্ষস্থানীয় পাঠক বলে দাবী করব। যে আমি এতদিন শুধু লেখকদেরই বই পড়ে এসেছি, লেখক হবো এ চিন্তাটি কস্মিকালেও ভাবিনি- সেই আমি কি পরিমাণ ভক্ত হলে লেখক হয়ে যাই?

'অলৌকিক প্রহর' বইটি আমার সর্বপ্রথম ধাপ। প্রশ্ন যদি করেন এই বইটি কাদের জন্য, নির্দিষ্ট করে জবাব দিতে পারব না। তবে আপনি যদি রোমাঞ্চ প্রিয় হোন, ভয় পেতে ভালবাসেন, পছন্দ করেন গা ছমছমে ভৌতিক গল্প তাহলে এই বইটি আপনার জন। প্রিয় পাঠক এত্ত লেকচারের প্রয়োজন হতো না, যদি না এটি আমার প্রথম বই হতো। প্রথম বই বলেই একটা কিছু বলার তাগিদ অনুভব করছিলাম- তাই আমার এ 'ভূমিকা'।

শুভেচ্ছা নিরন্তর।

০১.০২.০৫ ইং

www.pathagar.com

অলৌকিক প্রহর

সাইন কো

www.pathagar.com

রোমাঞ্চ গল্প

নাফে মোহাম্মদ এনাম

এনাম'স প্রকাশন

www.pathagar.com

অলৌকিক প্রহর

নাফে মোহাম্মদ এনাম

প্রকাশক

মোহাম্মদ এনামুল হক এনাম

এনাম'স প্রকাশন

চৌকিদেখী, সিলেট- ৩১০০। মোবা: ০১৭৬০৭৪৮৬৫

ই-মেইল: nafeeanam@yahoo.com. ওয়েব সাইট: www.anamsonline-bd.8k.com

©

লেখক

প্রচ্ছদ

ইয়াহ্ইয়া ফজল

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারী ০৫ইং

ডিজাইন ও মুদ্রণ

সাইন কো

বিজ্ঞাপনী সংস্থা

১০৬ আল-মারজান শপিং সেন্টার

জিন্দাবাজার, সিলেট।

প্রাপ্তিস্থান

বইপত্র (জিন্দাবাজার) জনতা লাইব্রেরী (আম্বরখানা)

ফ্রেন্ডস্ লাইব্রেরী (হাউজিং এস্টেট)

মূল্য

৩০.০০ টাকা

ALOIKEK PROHOR by **Nafee Muhammad Anam**

Price: 30.00 USA: 5 Doller Uk: 4 Paund

www.pathagar.com

আম্মাকে-
রাত জেগে লেখালেখির অপরাধে
যাঁর বকাঝকা, পিঠুনি এবং কানমলা
আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণা।

আব্বাকে-
যার ছেড়ে দেয়া সীমাহীন স্বাধীনতা
আমাকে গড়ে তুলেছে আমার মত করে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মোনালিসার হাসি /০৯
ভূতুড়ে জনপদ /১১
প্রেত-মৃত্যু /১৫
পাঁচ নম্বর কফিন /১৯
প্রতিকৃতি /২৩
অলৌকিক প্রহর /২৬

www.pathagar.com

Anything everything of course that nathing But something is that something.

-Nafee Anam

www.pathagar.com

মোনালিসার হাসি

মোনালিসার পোর্ট্রেটটি আঁকতে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সময় লেগেছিল পাক্কা তিন বছর, কিন্তু হাবিব মোল্লার সময় লাগল মাত্র তিনদিন! অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দক্ষ আর্টিস্টরা পেন্সিলের কয়েক টানে যদি মুহূর্তেই দুয়েকটা চিত্র তৈরী করে ফেলতে পারে কল্পনার রঙতুলিতে, তবে সেক্ষেত্রে একটা তৈরী ছবি দেখে দেখে পূনরায় তৈরী করা সাধারণত তাদের জন্য কোন ব্যাপার না। হাবিব মোল্লার ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। খুব কম সময়ের মধ্যে হলেও কাজটা যে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে করেছে। যার ফলে একজন অভিজ্ঞ চিত্রশিল্পী ছাড়া কেউ সহজে বুঝতেই পারবে না যে এটা একটা নকল ড্রইং। আসল ছবিটার মতই বেশ সুন্দর আর জীবন্ত হয়েই ফুটে উঠেছে ছবিটা।

নিজের আঁকা ড্রইংটার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাল হাবিব। নিশ্চিত হল কোন ভুল বা খুঁত নেই ছবিটাতে। সেই হৃদয় নাড়ানো মন মাতানো অদ্ভুত আর রহস্যময় হাসি, ভৌতিক অথচ মায়াবী চাহনী- সবই ঠিক আছে। যেন সাক্ষাৎ ভিঞ্চির হাতের পরশে তৈরী মোনালিসার নতুন সংস্করণ। নিজের কাজে নিজেই পুলকিত হল হাবিব মোল্লা। ছবিটা সে এঁকেছে নিজের বেডরুমের দেয়ালে। ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে, পুরো জায়গা জুড়ে। এই দেয়ালে আরো অনেক ছবি এঁকেছে, সবগুলোই চাপা পড়েছে মোনালিসার ছবির নিচে। একেকটা ছবি এক সপ্তার বেশী আঁকা থাকে না দেয়ালটাতে। কিন্তু মোনালিসার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল ব্যাপারটা। হাবিবের কেন জানি মনে হচ্ছে কাজটা করা ঠিক হবে না। তাছাড়া মনটাও সায় দিচ্ছে না ছবিটা মুছতে। অদ্ভুত এক অনুভূতি কাজ করছে ওর মনে। অবশ্য ছবিটা হাবিব মুছে ফেলবে কি ফেলবে না তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ, এ বাসায় আর থাকছে না সে। আজ বিকেলেই সে অন্য বাসায় বদলি হয়ে যাচ্ছে। মাস দু'মাস অন্তর অন্তর ও বিভিন্ন বাসায় ভাড়া থাকে। এক সঙ্গে তিনমাসের বেশি কোন বাসায় ওর মনটা ঠেকে না। রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বিষয়টা। ওর ছবিগুলো নজর কাড়া হওয়ার সুবাদে বাড়িওয়ালারাও আপত্তি করেন না।

হাবিব ভাবছে মোনালিসার এই ছবিটাও সে এই বাসাতে উপহার রেখে যাবে কিনা। অবশ্য এটি ওর নিজস্ব ছবি নয় বলেই একটু অস্বস্তি লাগছে ওর। কিন্তু অবশেষে হাবিব সীদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে ছবিটা যেমন আছে তেমনই রেখে যাবে সে। বাকিটা বাড়িওয়ালার ইচ্ছা। রাখলে রাখুক, নচেৎ মুছে ফেলুক।

চুরুটটা ঠোঁটে ঝুঁলিয়ে উঠে দাঁড়াল হাবিব মোল্লা। বহুদিনের ব্যবহৃত পরিত্যক্ত টুলটা পা দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখল। মোনালিসার ছবিটা ছাড়া এখন এই বেডরুমটা পুরো খালি। অথচ গতকালও এই ঘরটা দৈনন্দিন আসবাবপত্রে ঠাসা ছিল। ঘরের সমস্ত মালপত্র নতুন বাড়িতে চালান দিয়ে দিয়েছে হাবিব আজ সকালেই। এখন বিদায়ের পালা। রুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মত ছবিটার দিকে পিছ ফিরে তাকাল ও।

www.pathagar.com

পূনরায় ঘুরে দাঁড়িয়ে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই ঝট্ করে আবার ফিরে তাকাল। পরক্ষণেই থমকে গেল। কেঁপে উঠল ওর পা জোড়া। মুহূর্তেই কপাল কুঁচকে চোখে ফুটে উঠল সীমাহীন বিস্ময়!

প্রচন্ড অবাক আর হতবিহ্বল অবস্থায় হাবিব মোল্লা দেখল মোনালিসার ঠোঁটে হাসি নেই!

'ইস্! ছবিটা সত্যিই দারুন ছিল আন্টি-' অনেকটা হতাশ কণ্ঠে বলল রায়হান, 'ফ্রেম হলে তুলে নিয়ে যেতাম।'

'সেজন্যই তো আমি এ ঘরটাতে এখনও পেইন্টিং করছি না।' বললেন বাড়িওয়ালি আন্টি। 'তোমার আগেও এখানে ভাড়াটে যারা এসেছিল তারা সবাই ছবিটার প্রশংসা করে গেছে।'

মোনালিসার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন আন্টি তার ভাড়াটে ছোকরা রায়হানের সাথে। রায়হানও আজ তল্পিতল্পাসহ বাড়ি ছাড়ছে। পাক্কা দু'মাস কাটিয়েছে যে এ বাড়িতে। মোনালিসার ছবিটা সত্যিই তাকে দারুণ মুগ্ধ করেছে। রায়হান জেনেছে বছর খানেক আগে 'হাবিব মোল্লা' নামের এক ভদ্রলোক এ ছবিটা এঁকে রেখেছিলেন। আজও এই ছবিটা তরতাজা আছে। যারা ভাড়াটে এসেছিল তারাই যত্ন নিয়েছিল ছবিটার।

'আচ্ছা আন্টি, হাবিব সাহেবের কোন ঠিকানা কি আপনার জানা আছে?' কৌতুহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রায়হান। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করল আন্টি কেমন জানি বিব্রত হলেন। হকচকিয়ে গেলেন যেন।

'ইয়ে... হাবিব সাহেব তো শুনেছি মারা গেছেন অনেকদিন হল। আমার বাসাটা ছাড়ার পরপরই।' কেমন জানি অসহিষ্ণু কণ্ঠে কথাটা বললেন আন্টি। অবাক হল রায়হান। তবে এই কথাটা শুনে নয়, অন্য একটা কথা চিন্তা করে। ও জেনেছে ওর আগে এ বাসায় যারা এসে উঠেছিল তারা সবাই... সবাই বলতে চারজন ব্যাচেলর। এ বাসা ছাড়ার দিন দু'য়েক পরই রহস্যজনক ভাবে মারা যায় ওরা। সবাই আলাদা আলাদা ভাবে এখানে ছিল অনেকদিন। তবে কি রায়হানও... অশুভ চিন্তাটা মাথায় আসতে মনে মনে ঝেড়ে নিজেকে ধমক লাগাল রায়হান। আসলে ও একটু খুঁতখুঁতে টাইপের ছেলে। রহস্যের গন্ধ পেলেই হাতড়াতে থাকে।

'উহু!' আন্টির কথা শুনে যেন হতাশ হল রায়হান। 'ভেবেছিলাম হাবিব সাহেবের সাথে দেখা করে নিজের জন্যও একটা পৌট্রেট তৈরী করে নেব।'

'ব্যাপারটা স্বার্থপরের মতই হয়ে গেল না।' ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে ঠাট্টা করলেন আন্টি। পরক্ষণে দু'জনেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

'ঠিক আছে আন্টি, আমি তাহলে আসি।' বলে কাধের ব্যাগটা ঠিক করে ফ্লোরে রাখা লাগেজটার হাতল ধরল রায়হান। অন্য হাত দিয়ে ঝুঁকে আন্টিকে সালাম করতে গেলে বাধা দিলেন আন্টি। বললেন, 'ভাল থেকো বাবা, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন!' কথাটা আন্টি এমনভাবে বললেন যেন অজানা আশঙ্খায় ভুগছেন। তবে বিষয়টা তেমন গুরুত্ব দিল না রায়হান। বিদায়ের আগে শেষবারের মত মোনালিসার পোট্রেটে নজর বুলাল এবং দেখল, মোনালিসার ঠোঁটে হাসি নেই!

www.pathagar.com

ভূতুড়ে জনপদ

প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় বিছানা ছাড়তে হয় ফতেহ্ আলীকে। তারপর ফ্রেশ হওয়া, নাস্তা, পোশাক পরা এবং সবশেষে সাইকেল নিয়ে রওনা হতে হয় পেপার এজেন্সীতে। হকারের দায়িত্ব পালন করে হায়দার আলী। আজও নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। ঘুম থেকে উঠে যথারীতি টুকটাক কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ল হায়দার আলী।

বাইরে তখনও অন্ধকার। কনকনে ঠান্ডা হাওয়াও বইছে বাতাসে।

'যাচ্ছেল ! শীতের দাপট সামলাতে সামলাতে চাপা বিরক্তি প্রকাশ পেল ফতেহের কণ্ঠে। 'আরো গরম কাপড় পরা উচিত ছিল...,' বিড়বিড় করে সাইকেলে জোড়সে প্যাডেল হাঁকাল ও।

দক্ষিণা বাতাস বইছে বলে রক্ষা, নচেৎ সামান্য টি-শার্ট ও হালকা সোয়েটারের নিচে পরা সূতির প্যান্ট ঠান্ডা শিরশিরে বায়ুর ধকল সামলাতে পারত না। নির্ঘাৎ বরফ হয়ে যেত শরীর।

নিজের ওপর এক কিস্তি বকাঝকা করে পেপার স্টলে পৌঁছুল ফতেহ্। পত্রিকার স্তুপ থেকে নিজের গুলি বেছে নিল। আশেপাশে অন্য কাউকে দেখতে না পেয়ে বেশ অবাকই হল ও। ব্যাপার কি? ম্যানেজার চাচ্চুকেও দেখা যাচ্ছে না কোথায়ও। পত্রিকার গাড়ি অভ্যাসমত পত্রিকা ফেলে রেখে চলে গেছে। কিন্তু কেউ না থাকলে তো এতগুলো পত্রিকা চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামালো না সে। বার কয়েক দোকানের পাটে ধাক্কা লাগিয়ে ম্যানেজারের ঘুম ভাঙানোর চেষ্ঠা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে চলল ফতেহ্।

মহল্লায় ফিরে এসে নিজের ছাউনিতে সাইকেলটা রেখে পত্রিকা বিলি করতে নেমে পড়ল ও। প্রতিদিনই পায়ে হেটে পত্রিকা সরবরাহ করে। এতে স্বাভাবিক ব্যায়ামটাও হয়ে

www.pathagar.com

যায়। তবে কাজে নামার আগে ছাউনির পাশে নিজের ছোট্ট কুঠিরটায় ঢুকে গরম কিছু পোশাক গায়ে জড়াতে ভুলল না হায়দার। তারপর নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে পড়ল সে।

নিয়ম মাফিক মি. জনসনের বাসা থেকেই শুরু করল। এরপর একে একে মি. রবার্ট, মি. এ্যান্থনি, মি. চার্লি, মি. সোলেয়মান ও মি. পার্ডি'র বাসায় পত্রিকা রেখে একটু বিরতী নিল ও। হঠাৎই একটা বিষয় খেয়াল হতেই অবাক হল হায়দার। কি ব্যাপার, আজ এত নির্জন আর নিস্তব্ধ কেন চারদিক? তাছাড়া এতক্ষণে তো আলো ফুটে যাওয়ার কথা। অন্যান্য দিন তো পেপার এজেন্সী থেকে পত্রিকা নিয়ে আসতে আসতেই সকাল হয়ে যায়।

হাতঘড়ি নেই, নচেৎ সময়টা দেখে নেয়া যেত।

এদিক-ওদিক তাকালো ফতেহ্। ধোঁয়ার মত ভেসে বেড়াচ্ছে কুয়াশা। চারিদিকটা অস্বাভাবিক নিঝুম আর নিরব। এরকম ভুতুড়ে পরিবেশে মোটেও অভ্যস্ত নয় ও। কেমন জানি গা'টা ছমছম করে উঠল ওর। পত্রিকাগুলো বুকে চেপে হাঁটা ধরল। অন্যান্য দিন আযানের শব্দ শোনা মাত্রই মুসলমান মুরুব্বীরা বেরিয়ে পড়তেন মসজিদের উদ্দেশ্যে। খ্রিস্টান বয়োঃবৃদ্ধরা জগিং করার জন্য আলো ফুটার আগেই নেমে পড়তেন লেনে। কিন্তু আজ আযানের ডাকও কানে আসেনি ফতেহ্। আর একটি কুকুর-বেড়ালেরও চিহ্ন পর্যন্ত নেই আশেপাশে।

হতভম্ব হয়ে পড়ল ও। সময়ে গোলমাল পাকিয়ে ফেলেনি তো ও? কিন্তু ঘরের ছোট্ট এ্যালার্ম ঘড়িতে তো নিজের চোখেই পাঁচটা বাজতে দেখে বেরিয়েছিল সে। তাহলে?

এসব হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সামনে মি. পিটারের প্লটটা আবিস্কার করল হায়দার। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ও। বোকার মত একমুহূর্ত চোখ পিটপিট করে মি. পিটারের ফটক গ্রীলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর সংবিৎ ফিরে পেতেই ঢুকে পড়ল ভিতরে।

মি. পিটারের এ হাউসটাই মহল্লার সবচেয়ে বড়। একেবারে দূর্গের মত। হাউজিং এস্টেটের মত আবাসিক জায়গায় এরকম প্রকান্ড অট্টালিকা চিন্তাই করা যায় না।

গেটে সবসময় একজন দারোয়ান বসে থাকত। তার সাথে থাকত বিশাল অ্যালসেসিয়ান কুকুর। কিন্তু আজ এদের কাউকেই দেখা গেল না।

বাগানের লন ধরে হেঁটে পোর্চে এসে হাজির হল হায়দার। কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর। পরিস্তিতির কিছুই আঁচ করতে পারছে না। কিন্তু বুঝতে পারছে, একটা কিছু হয়ত ঘটতে পারে আজ। যেন বিষয়টাকে সত্যি করে তোলার জন্যই, অদূর কোথাও থেকে ভেসে এল গা হীম করা ভয়ংকর আর্তনাদ। শব্দটা কোন পশুর নাকি মানুষের ঠিক বুঝা গেল না।

জায়গায় জমে গেল ফতেহ্! ক্ষণিকের জন্য ওর মনে হল শব্দটা এসেছে দক্ষিণের কাপাসি অরণ্য থেকে। শুনেছে ওখানটায় নাকি নেকড়ের মত হিংস্র জানোয়ার থাকাটা বিচিত্র নয়।

আসলে ফতেহ্ হাউজিং এস্টেটে খুব বেশিদিন হয়নি এসেছে।

এর আগে ও কাজ করত লুইস ভ্যালিতে। এখন ক্যালিফোর্নিয়ার এদিকটায় চলে

www.pathagar.com

এসেছে। এখানকার হাওয়া-বাতাস সম্পর্কে মোটেও ধারণা নেই ওর।

কোন রকমে পেপারটা মি. পিট্টারের দরজার নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে হনহন করে হাঁটা ধরল হায়দার। ঠিক করেছে এখন সোজা ছাউনিতে ফিরবে। লোকজনের সাড়াশব্দ না পাওয়া পর্যন্ত পত্রিকা বিলি করতে বেরোবে না।

গেটের কাছে আসতেই দারোয়ান লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে শক্তি পেল ফতেহ্। কাছে এসে মৃদু হেসে সুপ্রভাত জানিয়েও কোন লাভ হল না। লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল স্ট্যাচুর মত। আবছা অন্ধকারে তার মুখ দেখার চেষ্ঠা করল হায়দার। পরক্ষণেই দারোয়ানের মুখটা দেখেই প্রচন্ড ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল ও।

একি' পুরোটা মুখ থেত্‌লে গেছে লোকটার। চোখ-মুখ বেয়ে রক্ত ঝরছে! নিজের কথা ভুলে গেল ফতেহ্। হাতের সমস্ত পত্রিকা ফেলে সামনে থেকে দারোয়ানকে সরিয়ে ছুটে গলিতে নেমে এল ও । ঠিক তখুনী অ্যালসেসিয়ান কুকুরটার গর্জন শুনতে পেল। গেটের দরজাটা কোনমতে লাগিয়ে দৌড়াতে শুরু করল যাতে কুকুরটা বেরিয়ে এসে পিছু নিতে না পারে।

কুয়াশা যেন চাদর বিছিয়ে দিয়েছে রাস্তায়। অনিশ্চিত পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে হায়দার। ভয় আর আতঙ্ক দিশেহারা করে ফেলেছে ওকে। হঠাৎ একপাশে তীক্ষ্ণ শীসের মত শব্দ হতেই ফিরে তাকাল ও। দেখল মি. সোলেমানের বার্গেডে চার পাঁচজনের দলবদ্ধ মূর্তি। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, অনড়-নিশ্চল। যেন ওর এহেন অবস্থা দেখে মৃদু পরিহাস করছে সবাই।

সামনের দিকে মনোযোগ দিল ফতেহ্। কিন্তু থমকে দৌড় বন্ধ করে দাঁড়াল ও । কুয়াশার আবছা আঁধারে স্পষ্ট সামনে দেখতে পাচ্ছে অসংখ্য ছায়ামূর্তির ভীড়। সবগুলো ওর দিকে এগিয়ে আসছে। কেমন জানি 'অ-ও-উ-ম!!' ধরণের শব্দ কানে বাজছে।

উল্টোঘুরে ছুট লাগল হায়দার। কিন্তু বেশি এগোতে পারল না। ওদিক থেকেও এগিয়ে আসছে অসংখ্য ছায়ামূর্তি!

ভয়, আতঙ্ক, এসে একসঙ্গে যেন চেপে ধরল ওকে। কোনদিক দিয়ে পালাবে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পাগলের মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ও। কিন্তু যেদিকেই তাকায় শুধুই নরমন্ডু নজরে পড়ে। রক্তাক্ত আর বিভৎস মুখমন্ডল!

এত উত্তেজনার মধ্যেও হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ফতেহ্। গতকাল ও যখন পেপার এজেন্সীতে গিয়েছিল তখন ম্যানেজার চাচ্চু ওকে আজ আসতে মানা করে দিয়েছিলেন। এক সহকর্মীকে কারণটা জিজ্ঞেস করতে ছেলেটা বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল আজ নাকি 'হ্যালুউইন নাইট'। এ রাতে প্রেতলোক থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে অশরীরী আত্মা, ভূত-প্রেত। বিশেষ করে এই শহরটা নাকি মৃত নগরীতে পরিণত হয়। অন্য শহরগুলোর মত এখানে সবাই আনন্দফূর্তি করে না, ভূত সাজে না বা চকোলেট বিতরণ করে না। কারণ, কয়েক যুগ আগে এক হ্যালুউইন রাতে এই শহরে রহস্যজনকভাবে গায়েব হয়ে যায় অসংখ্য মানুষ। তাদেরকে আর দেখা যায়নি। এরপর থেকে...।

বেশীক্ষণ চিন্তা করতে পারল না ফতেহ্। ওর মোটা গরম কাপড় ভেদ করে একটি

www.pathagar.com

হাতের ঠান্ডা শীতল স্পর্শ অনুভূত হল। এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিল ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ও। আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলল। এবং..., আতঙ্কের শেষ সীমানা অতিক্রম করল সে! মুহূর্তেই সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল ওর। সামনে দাঁড়ানো মূর্তি ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতে কিলবিল করছে কিছু। সাপ! পরক্ষণেই কানে ভেসে এল হিস্‌হিস্‌ শব্দ গুঞ্জন। সমস্ত শব্দ প্রতিকূলতা থমথমে স্তব্ধতায় পরিণত হল যখন ফতেহ্‌ নিজের সামনে দাঁড়ানো মূর্তিটার মুখের ওপর নজর ফেলল। চরম বিস্ময় নিয়ে ফতেহ্‌ দেখলো, যে মূর্তিটা ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেটা আর কারো নয়, স্বয়ং ওর নিজের প্রতিমূর্তি!

প্রচন্ড বিস্ময়ে মুখটা হাঁ হয়ে গেল ফতেহ্‌। আর ঠিক তখুনী ওরই প্রতিমূর্তি প্রচন্ড দ্রুতবেগে ওর হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের ভেতর নিজের হাত ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু একি! এতো হাত নয়, সাপ!

হায়দার অনুভব করল ওর কণ্ঠনালী চিরে গলার ভেতরে ঢুকে গেছে সাপের মুখ অর্থাৎ প্রতিমূর্তির হাত এবং পরক্ষণেই সে স্পষ্ট উপলব্দি করল সাপটা গলার ভেতর দিয়ে ঢুকে ওর পেট চিরে বেরিয়ে আসছে। পেট চেড়ার 'চ্যাঁড়...ড়ড় চ্যাঁড়াৎ!!!' শব্দটা কানে বাজল না ফতেহ্‌। হারিয়ে গেল সে সীমাহীন যন্ত্রণা আর ভয়হীন জগতের আড়ালে। কিন্তু ওর তীব্র ভয়াবহ আর্তনাদ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে দূর পাহাড়ে বিলীন হয়ে গেল ধীরে ধীরে। তবে ছড়িয়ে গেল একটুকরো নিঝুম-নিথড় নিস্তব্ধতা।

শহর জুড়ে সূর্যের আলো যখন প্রস্ফুটিত হল তখন হাউজিং এস্টেটের বাসিন্দারা রাস্তায় বেরিয়ে আবিস্কার করল ছিন্নভিন্ন কিছু মাংসপিন্ড। ওগুলো যে মানুষের তা বোঝা গেল কয়েক হাত দূরে পড়ে থাকা ক্ষতবিক্ষত মাথা দেখে। তবে এজন্য কারো মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। কেননা, এসব স্বাভাবিক ঘটনা! যা হওয়ার তাই হয়েছে...!

www.pathagar.com

প্রেত - মৃত্যু

জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা 'ছেলেবুড়ো' এর সম্পাদক 'রবার্ট হান্না'র চোখ আটকে গেল সাধারণ অথচ অন্যরকম একটি চিঠির ওপর। শতাধিক চিঠিপত্রের মধ্য থেকে তিনি ওই চিঠিটা হাতে তুলে নিলেন। প্রথমে চিঠির সাথে স্ট্যাম্পিং করা ফেরত খাম বেরিয়ে এল, সেই সঙ্গে একটুকরো কার্ড। চোখের সামনে চিঠিটা মেলে ধরলেন সম্পাদক সাহেব। প্রেরকের হাতের লেখাটা অতিরিক্ত পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক বুঝতে পারছেন না কার হাতের লেখা এটি। কার্ডটায়ও চোখ বুলালেন। আশ্চর্য! এরকম কার্ড আগেও দেখেছেন বলে মনে হল মি. হান্নার। শুধুমাত্র এসমস্ত কারণেই চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে পড়লেন তিনি।

'মিস্টার রবার্ট হান্না,

ভাল আছেন নিশ্চয়ই? যেভাবেই হোক আমি জেনে গেছি যে আপনিই হচ্ছেন দেশের খ্যাতিমান লেখক 'অনন্ত নিগার'! আমি ইতিমধ্যেই আপনার সমস্ত বই পড়ে ফেলেছি। তাছাড়া আমি আপনার পত্রিকারও একজন নিয়মিত পাঠিকা বলতে পারেন। যাইহোক, আমি একটি ফেরত খাম এবং একটি কার্ড এই পত্রের সাথেই সংযুক্ত করলাম। দয়া করে আমার কার্ডে আপনার অটোগ্রাফ দিয়ে ফেরত পাঠাবেন। কথা দিচ্ছি- আপনার ছদ্ম পরিচিয় আমি ফ্ল্যাশ করব না।...'

এরচেয়ে বেশি কিছু পড়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না রবার্ট হান্না ওরফে অনন্ত নিগার। বিষয়টা তাকে ভীষণ বিস্মিত করেছে। এই মানুষটি কে? অনন্ত নিগার ছদ্ম নামটা একমাত্র তিনি নিজে ছাড়া দ্বিতীয় কারো জানার প্রশ্নই ওঠে না।

অতিব আশ্চর্যের বিষয় হলেও আপাতত বিষয়টা নিয়ে তেমন মাথা ঘামালেন না সম্পাদক সাহেব। প্রেরকের কার্ডে একটা অটোগ্রাফ দিয়ে ওটা ফেরত খামে পুরলেন। তারপর অভ্যাসমত জিভ দিয়ে খামের আঠা গলিয়ে খামের মুখ বন্ধ করে দিলেন। অফিসের

www.pathagar.com

কেরাণী লোকমানকে ডেকে বলে দিলেন, সে যেন খামটা পত্রিকার ব্যক্তিগত ডাকবাক্সে ছেড়ে দেয়। লোকমান চিঠিটা নিয়ে চলে যেতেই ডেস্কের ওপর রাখা তার মোবাইলটা বেজে উঠল। কলটা রিসিভ করলেন মি. হান্না।

'হ্যালো...,' বলতেই ওপাশ থেকে একটা আন্তরিক মেয়েলী কণ্ঠ ভেসে এল।

'হ্যালো মিস্টার রবার্ট হান্না! এই মুহূর্তে আপনি নিজের অটোগ্রাফ যার ঠিকানায় পোস্ট করলেন আমি সেই...'

'স্ট্রেঞ্জ!', আন্তরিক অথচ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন মি. হান্না। 'আপনি তো আমাকে ভীষণ অবাক করে চলেছেন। ম্যাডাম, আপনি কে বলুন তো?'

'আমি?', ওপাশে একটু নিরবতা, তারপর আবার- 'আমি কে যেটা আপনি ভাল করেই জানেন কিন্তু চিনেন না!''

'অদ্ভুত কথা বল্লেন ম্যাডাম!'

'হ্যাঁ অদ্ভুতই বটে। এবার আরেকটা অদ্ভুত কথা শুনুন, আপনি আর মাত্র পাঁচ মিনিট বেঁচে থাকবেন। তারপর..'

কথাটা শুনার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেল মি. হান্নার। জায়গায় জমে গেলেন তিনি, তবে মেয়েটার কথাটা শুনে নয়। কণ্ঠ শুনে। হ্যাঁ, এই কণ্ঠটাই! এই কণ্ঠটাই গতকাল গভীর রাতে তাকে ফোন করে হুমকি দিয়েছিল যে আজকের দিন তার জীবনের শেষ দিন! আর হ্যাঁ, এখন স্পস্ট বুঝতে পারছেন কেন এই চিঠির হাতের লেখা আর কার্ড এত চেনাচেনা লাগছিল। হ্যাঁ, ঠিক ওরকমই একটা কার্ড আর হাতের লেখা উড়ো চিঠি গতকাল সকালে তিনি পেয়েছিলেন। ওই চিঠিটায় তাকে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়েছিল প্রেরক। কার্ডে কারো নাম ছিল না। শুধু একটা অদ্ভুত নাম লেখা ছিল। বিষয়টা তখন কারো মশকরা ভেবে মোটেও পাত্তা দেননি সম্পাদক সাহেব। ভেবেছিলেন বন্ধুবান্ধবদের কেউ হয়ত ইয়ার্কি করছে।

'কি ভাবছেন মি হান্না? মনে হয় আঁচ করতে পেরেছেন আমি কে?' তিরস্কারের সুরে কথাটা বলল অচেনা কণ্ঠটা।

'আপনি কে আমি জানি না। কিন্তু এসবের মানে কি?'

'আপনার হাতে আর মাত্র চার মিনিট সময় আছে, ফালতু প্রশ্ন না করে এটা জিজ্ঞেস করুন যে আমি কেন আপনাকে বিষ খাওয়ালাম!'

'বিষ! হোয়াট ননসেন্স!!' বিষম খেলেন যেন সম্পাদক।

'উত্তেজিত হবেন না মিস্টার হান্না, কিছুক্ষণ আগে যে খামে আপনি জিভ দিয়ে আঠা লাগিয়েছেন সেই খামের আঠায় বিষ ছিল... হা:! হা:! হা:!!,' ওপাশের কণ্ঠটা খিলখিল করে হেসে উঠল।

কথাটা শোনামাত্রই ঝট করে হাত দিয়ে জিভ মুছলেন মি. হান্না। বার কয়েক থুথুও ফেললেন। কাজটা বোকার মত মনে হলেও সত্যি সত্যিই এই মুহূর্তে পুরোপুরি আতঙ্কিত তিনি।

'কোন লাভ নেই মিস্টার। স্রষ্টার কাছে শেষ ফরিয়াদটুকু সময় থাকতেই সেরে ফেলুন!'

'কিক্... কি, কি চান আপনি আমার কাছে...?' গলায় হাত দিয়ে বললেন সম্পাদক।

www.pathagar.com

'যা চেয়েছি তা পেয়েছি, আপনার মৃত্যু!' বলেই আবার গা শিউরানো বিকট কণ্ঠে হেসে উঠল ওপাশের কণ্ঠটা।

'কিন্তু আমার অপরাধ?' জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মি. হান্না।

'ঠিক আছে মি. হান্না, মৃত্যুর পূর্বেই আপনার সমস্ত কৌতুহল আমি এক কথায় মিটিয়ে দিচ্ছি...।'

'হ্যাঁ, বলুন প্লীজ...' অসহায় ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন সম্পাদক রবার্ট হান্না।

'আমি ভয়াল মন্দিরের কুহকিনী!'

কথাটা শোনামাত্রই ঝুপ্ করে সুইভেল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার রবার্ট হান্না। এই প্রথম নিজের মধ্যে বিষক্রিয়ার প্রভাব আবিস্কার করলেন তিনি। হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে গেল ডেস্কে। তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। নিস্তেজ হয়ে আসছে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অকেজো হয়ে যাচ্ছে মস্তিস্ক। বিষের যন্ত্রণার চেয়ে প্রচন্ড আতঙ্ক তাকে পুরোপুরি অসাড় করে ফেলল। পাথরের মত শক্ত হয়ে যাচ্ছে শরীর। মনে হচ্ছে আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা আঙুলও নাড়াতে পারবেন না তিনি। বসার চেষ্টা করতে গিয়ে হুড়মুড় করে ফ্লোরে পড়ে গেলেন মি. হান্না। চিৎকার করে লোকমানকে ডাকতে গেলেন। কিন্তু অনুভব করলেন প্রচন্ড শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। মুহূর্তেই গোটা পৃথিবী যেন চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল তার। দুলতে লাগল সবকিছু। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন মি. হান্না, সময় শেষ হয়ে আসছে তার। ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা মোবাইল থেকে জোড়াল শব্দে নারীকণ্ঠের অট্টহাসি ভেসে এল তার কানে। কর্কশ আর তীক্ষ্ণ, কিন্তু আবছা। ধীরে ধীরে শব্দটা যেন হারিয়ে গেল দূরে, বহুদূরে...!!

ভয়াল মন্দির, লোকমুখে এ নামেই প্রচলিত। কক্সবাজারের জনমানবহীন এক প্রত্যন্ত এলাকায় এ মন্দিরের অবস্থান। বহু কল্পকাহিনী আর গুজব আছে এ পরিত্যক্ত মন্দিরটিকে ঘিরে। কথিত আছে- বহু বছর আগে সমাজ পরিত্যক্তা এক যুবতী মেয়ে এই মন্দিরে এসে ঠাঁই নিয়েছিল। কিন্তু সমাজ তাকে এখানেও বেঁচে থাকতে দেয়নি। নৃশংসভাবে মেয়েটিকে সবাই এই মন্দিরের সাথে পুড়িয়ে মেরেছিল। কেন মেয়েটি সমাজ পরিত্যক্তা ছিল জানা না গেলেও সবাই বলাবলি করে এই মন্দিরে নাকি ওই মেয়েটির প্রেতাত্মা বসবাস করে। সমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে নাকি মেয়েটির অতৃপ্ত আত্মা ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায় গোটা মন্দির জুড়ে। শিক্ষিত সমাজের লোকেরা বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিলেও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আজ পর্যন্ত যারা এই মন্দিরকে নিয়ে অতিরিক্ত কৌতুহল দেখিয়েছে বা ওখানে প্রবেশ করেছে তাদের কেউ কেউ হয় পাগল নয়ত রহস্যজনকভাবে খুন হয়ে যায়। সবাই বলাবলি করতে থাকে এসব হচ্ছে ভয়াল মন্দিরের কুহকিনীর অভিশাপ। এ সমস্ত ঘটনা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে জনমনে। আর ব্যাপারটা যখন ধীরে ধীরে চারিদিকে রটতে লাগল তখন একের পর এক চিঠি আসতে লাগল দেশের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন 'ছেলেবুড়ো'-র অফিসে। পাঠকের দাবী ভয়াল মন্দিরকে নিয়ে যেন একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ব্যাপারটা প্রথম প্রথম গুরুত্ব না দিলেও পাঠকের চিঠির সংখ্যা যখন হাজার খানেক অতিক্রম করল তখনই

www.pathagar.com

টনক নড়ল সম্পাদক রবার্ট হান্না'র। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ভয়াল মন্দিরের উপর সরেজমিনে একটা জমজমাট প্রতিবেদন তৈরী করে প্রকাশ করবেন। পাশাপাশি এটাও দেখিয়ে দেবেন যে ভয়াল মন্দিরকে নিয়ে রচিত কল্পকাহিনীগুলো নিতান্তই কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না। ইতিমধ্যেই লোক লাগিয়ে খবর নিয়ে জেনেছেন যে ভয়াল মন্দিরে যারা ঢুকেছিল তাদের অপঘাত মৃত্যুর রহস্য সত্যি সত্যিই মন্দিরকে ঘিরেই। কিন্তু তবুও পাত্তা দিলেন না তিনি। স্বয়ং নিজে গিয়ে টানা দু'দিনের এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে অবশেষে প্রকাশ করলেন প্রচ্ছদ প্রতিবেদন 'ভয়াল মন্দিরের অজানা কাহিনী'- নামে। পত্রিকা প্রকাশ হওয়ার প্রথম দিনই দশ হাজার কপি নি:শেষ হয়ে যেতে দেখে ভীষণ প্রভাবিত হলেন রবার্ট হান্না। যে দু'দিন তিনি কক্সবাজার থেকে ভয়াল মন্দিরের ওপর রিপোর্ট তৈরী করেছেন তখন প্রয়োজনের জন্য বহুবার তাকে মন্দিরে ঢুকতে হয়েছে। অথচ কোনও ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়নি তার। প্রতিবেদনেও রসিয়ে কিছু লেখেননি। তারপরেও পাঠকের এত চাহিদা দেখে পুলকিত হলেন তিনি। অবশ্য একটা ব্যাপার নিয়ে অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও ভাবতে শুরু করেছেন তিনি। বিষয়টা হচ্ছে- ভয়াল মন্দিরকে নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করেছে, তাদের অধিকাংশই অপঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে- এবার কার পালা? সত্যিই কি ভয়াল মন্দিরের কুহকিনীর অভিশাপ বলে কিছু আছে?

পাঠক, আছে কি? উত্তরটা নিশ্চয়ই আপনার জানা?

www.pathagar.com

পাঁচ নম্বর কফিন

আমি 'ভয়-ভূতুড়ে' নামক একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। ইদানিং লক্ষ্য করছি আমার পত্রিকার একমাত্র নিয়মিত হররখ্যাত কিশোর লেখক 'হায়দার কৃষ্ণ'- এর কোন লেখাই এসে জমা হচ্ছে না। অথচ পত্রিকার সমস্ত পাঠক/পাঠিকা ওর গল্প না দেখে বিবিধ বক্তব্য পাঠাচ্ছে। তারা ঘটনা কি জানতে চাচ্ছে। ঘটনা কি সেটা তো আমিও জানতে চাচ্ছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে হায়দার কৃষ্ণের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। ওর মোবাইল অফ, টেলিফোনে লাইন নেই, ই-মেইল এ্যাটাচমেন্ট ফিরে আসছে। এমন কী পত্রিকা ওর ঠিকানায় পোস্ট করা হলেও ব্যাক হচ্ছে। ভীষণ অবাক হলাম আমি। এরকম তো হয়নি। আমার পত্রিকার বয়স আজ দেড় বছর পেরিয়ে গেছে, আর সেই সূচনা সংখ্যা থেকেই হায়দার আমার কাগজের নিয়মিত লেখক- অথচ কখনও লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে তার কোন গাফলতি হয়নি। আমি সব সময়ই ওর উপযুক্ত সম্মানী প্রদান করেছি। কিন্তু এখন কেন এমন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। ইতিমধ্যেই ওর লেখার জন্য শতাধিক চিঠি এসে আমার অফিসে জমা হয়েছে।

নাহ্! আর এভাবে বসে থাকা যায় না।

বিষয়টা খেতিয়ে দেখা দরকার।

সুতরাং, বৃষ্টিস্নাত এক বিকেলে আমি রওনা হলাম আমার লেখক বন্ধু হায়দার কৃষ্ণের বাড়ির উদ্দেশ্যে। ওর বাসা হচ্ছে মির্জাজাঙ্গালের তেরো নম্বর সাইটে। যতদূর জানি সিলেটের ওই জায়গায়ই ওর শেকড়। ওর দাদা 'মির্জা রায় কৃষ্ণ' ওদের বিশাল বাড়িটা যখন তৈরী করেন তখনকার সময়ে তিনিই ছিলেন উপমহাদেশের একমাত্র ধনকুবের ব্যক্তিত্ব। তিনি তৎকালীন সাহিত্য সাধনাকে নিয়ে গেছেন বহুদূর। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েই আজকের বিনোধ, হাফিজ, রিচার্ড এর মত প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিকদের নাম ছড়িয়েছে নভেল সোসাইটিতে। খুব সম্ভবত আমার মনে হয় হায়দার কৃষ্ণও তার দাদার গুনটা পেয়েছে। কেননা, আজ পর্যন্ত ও যা লিখেছে তা দিয়ে কম করে হলেও নিজের বিশ পঁচিশটা বই প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু সে তা না করে নবীন লেখক/ লেখিকাদের বই অহরহ প্রকাশ করে দিচ্ছে সম্পূর্ণ নিজ খরচে। তাও পৈতৃক সম্পত্তি থেকে নয়, নিজে

www.pathagar.com

লিখে যে আয় করে তা থেকে!
ওকে নিয়ে আমার ভীষণ গর্ব করতে ইচ্ছে হয়। অবশ্য আমি ঠিক করেছি সুযোগ পেলে ওর একটা সুবিশাল সাক্ষাৎকার আমার পত্রিকায় ছেপে দেব। আজ এ ব্যাপারে একটু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। ও অবশ্য প্রচার বিমুখ মানুষ। কখনও নিজের প্রচারণা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু যাদের জন্য ওর এত লেখালেখি, এত আয়োজন সেই পাঠকদের সে বিমুখ করবে কি করে!
যা হোক, ওর বাসায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল।
গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝেমধ্যে শব্দহীন বিজলী সাপের জিভের মত স্যাঁৎ করে ঝলক মেরে পূনরায় স্যাঁৎ করেই যেন হারিয়ে যাচ্ছে কালো আকাশের বুকে।
একটু একটু শীত লাগছে আমার। যদিও ভারী ভারী পোশাক ও জুতো পরে আছি তবুও। রেইন কোটের বদৌলতে বৃষ্টির ফোটা শরীরে কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না। তো, হায়দারের বাসায় আমি আগেও বহুবার এসেছি। সে হিসেবে বাড়ির সবাই আমাকে ভাল করেই চেনে। বাড়ির সবাই বলতে কেয়ারটেকার মদরিছ মিয়া, ড্রাইভার আব্দুল্লাহ্ আর বাবুর্চি হেকমত আলী। কৃষ্ণের পরিবার আমেরিকায় থাকেন। বাবা-মার একমাত্র সন্তান হিসেবে সে দেশেই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনা করে। অবশ্য ওর বাবা বিমল মির্জা গত হয়েছেন বছর তিনেক হল। তাই কৃষ্ণ প্রায় জোর করেই ওর মাকে বিদেশে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। দেশে তাই যে সম্পূর্ণ একা এই বাড়িতে বসবাস করে।
অন্যান্য দিন বাবুর্চি হেকমত আলী দরজা খুলে দিত। কিন্তু আজ স্বয়ং হায়দার কৃষ্ণকে দেখে সত্যিই অবাক হলাম। ব্যাপার কি, অন্যরা কোথায়? আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন হায়দার ম্লান হাসল।

একি হাল হয়েছে ওর! মুখটা শুকিয়ে কংঙ্কাল সার, চুলগুলো উস্কুখুস্কু। পরনের জামাকাপড়ও মলিন হয়ে আছে অযত্ন অবহেলায়। যেন অনেকদিন গোসল করে না হায়দার।
চোখ দু'টো কোঠরে বসে গেছে।
সেই সুস্থ, সবল, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী নায়ক নায়ক চেহারার হায়দার কৃষ্ণ আর এই হায়দার কৃষ্ণের মাঝে যেন আকাশ-পাতাল তফাৎ!
'অবাক হওয়ার কিছু নেই হাসান, ভেতরে এসো।' কেমন জানি মিনমিনে কণ্ঠস্বর হায়দারের। যেন একদিনে ওর বয়স বিশ বছর বেড়ে গেছে!
আমি ভেতরে ঢুকে ঘুরে দাঁড়ালাম। পেছনে দরজা বন্ধ করে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল ও। ওর শরীরিক অবস্থা দেখে আমার মুখে খই ফুটছে না। মাথায় যদি এই মুহূর্তে হিমালয় পর্বতও ভেঙ্গে পড়ত তবুও আমি হয়ত এতটুকু বিস্মিত হতাম না।
ও আমাকে বসতে বলল। আমি বিষয়টা কি জানতে চাইলাম।
হায়দার বলল তেমন কিছু না। কাজের লোকদের সবাইকে বিদেয় করে দিয়েছে সে। একথা শুনে আরো অবাক হলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম দৈনন্দিন জুট ঝামেলা সামলায় কি করে, বলল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

'আচ্ছা হায়দার, সত্যি করে বলতো হয়েছেটা কি তোমার?'
'সত্যি বলছি, তেমন কিছু না।' যেন আমার কথা অনেক দূর থেকে শুনেছে সেভাবে বলল হায়দার।
'বললেই হল, আমাকে বোকা পেয়েছো নাকি!' নাছোড় বান্দার মত চেপে ধরলাম আমি ওকে। সত্যি কথা না বলে যাবে কোথায়! কিন্তু ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম বিষয়টা ভাল লাগছে না ওর। তাই খুব একটা চাপাচাপি করলাম না আমি। হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হতেই যেন কৃষ্ণ উঠে দাঁড়াল। আমাকে বলল, 'তুমি আমার ঘরে গিয়ে বস। আমি আমাদের দু'জনের জন্য চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।'
শীত শীত আমেজটা উপলব্দি করতেই আমিও সায় দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মন্দ হয় না! কিন্তু হায়দার এই শরীরে... আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ও কিচেনের দিকে চলে গেল। আমি চলে এলাম ওর রুমে। সেই আগের মতই আছে রুমটা। শুধু একটু যেন আগোছাল, আর একটু পরিবর্তন... আরে হ্যাঁ, এই দরজাটা এল কোথা থেকে ওর ঘরে? এটা তো আগে দেখিনি! নিতান্তই কৌতূহল বশে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। কি জানি কেন, গাঁটা শিরশির করে উঠল। আর ঠিক তখুনী আশেপাশে খুব কাছে কোথাও 'কড়কড়কড়াৎ!' শব্দে বিশাল বাজ পড়ার শব্দ হল। ক্ষণিকের জন্য আঁতকে উঠলাম আমি। মনে হল কেউ যেন আমাকে অশুভ সংকেত জানিয়ে বলছে 'পালাও!'
কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম আমি।
ফালতু চিন্তাধারাকে ঝেরে বকা লাগালাম এক কিস্তি। তারপর আর কিছু না ভেবেই খুলে ফেললাম দরজা। স্বাভাবিকভাবেই।

সারি সারি কফিন রাখা আছে দেয়ালের একপাশে। মোট চারটা। আশ্চর্য! এখানে কফিন এল কোথ্ থেকে? তাছাড়া আমি এখন যেখানে আছি সেটা একটা বেসমেন্ট। স্যাঁতস্যাঁতে। আঁধো অন্ধকার, ছোট্ট একটা কুঠুরী যেন। স্টোর হাউসের মত, তাও ফাউন্ডেশন- মাটির তলায়!
অজানা এক আশঙ্খায় বুকটা কেঁপে উঠল আমার। ভাবতেও অবাক লাগছে এসব কি দেখছি আমি! তবে অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজেকে শক্ত করলাম।
এবার আর কৌতূহল নয়, ঝুঁকি নিয়েই একটা কফিনের প্রথম ঢালাটা তুলে ফেললাম আমি। একে একে সবগুলো। কিন্তু কফিনের ভেতরটা এতই অন্ধকার যে কিছুই দেখতে পারছি না। ঠিক তখুনী, আমার ইচ্ছেটাকেই যেন পূরণ করে দেয়ার জন্য বিলগেটের ফোকর দিয়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ ঝলকানি মুহূর্তের জন্য পুরো ব্যাসমেন্টকে দিনের মত আলোকিত করল। আর এই সামান্য সময়েরই মধ্যেই কফিনগুলোর ভেতরটা নজরে পড়ল আমার।
প্রথমে ত্রাসের এক ভয়াল স্রোত জায়েগায় জমিয়ে দিল আমাকে। প্রচন্ড বিস্ময় আর আতঙ্কে আমার মুখটা হাঁ হয়ে গেল! আবিস্কার করলাম কাঁপতে শুরু করেছে আমার হাত-পা। হঠাৎ পেছনে বিকট একটা শব্দ শুনে ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। দেখলাম সিঁড়ির ওপর দরজার কাছে বিরাট ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে হায়দার।

www.pathagar.com

ভয়ে নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, যখন দেখলাম ও একটা ছিন্ন হাতে চিবুচ্ছে! আতঙ্কের শেষ সীমাটুকু পর্যন্ত আমাকে গ্রাস করল মুহূর্তে। অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা যেন বাকশূন্য করে দিল আমাকে।

শেষবারের মত কফিনগুলোর মধ্যে আমার দৃষ্টি ঘুরে এল।

বাবুর্চি হেকমত আলী, কেয়ারটেকার মদরিছ মিয়া এবং ড্রাইভার আব্দুল্লাহ্‌র শবদেহের পাশের কফিনটাতেই আরেকজনের দেহ!

নিরস্বার, নিশ্চুপ ও গলিত। চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে জমাট বেঁধে গেছে! ঠিক অন্য লাশগুলোর মত।

পুনরায় ফিরে তাকালাম হায়দার কৃষ্ণের দিকে, ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক! ও ঠিক আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওকে। ওর নি:শ্বাসের সঙ্গে অসহ্য দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে!

জ্ঞান হারানোর ঠিক আগ মুহূর্তে ঠের পেলাম প্রচন্ড শব্দে, আকাশ মাটি কাঁপিয়ে ঠিক যেন মাথার ওপরেই বজ্রপাত হল! যেন পরিহাস করে গেল আমার নিয়তির সাথে। যেন বলে গেল- চার নম্বর কফিনে অন্যান্যদের মত শুয়ে থাকা 'হায়দার কৃষ্ণের' কফিনের সাথে যোগ হবে আরো একটা কফিনের, আর সেটা হচ্ছে...!

www.pathagar.com

প্রতিকৃতি

ঠক্‌ঠক্! দরজায় শব্দ হতেই খুলে গেল দরজা।

'আচ্ছা, এখানে ফারিয়া নামের যে মহিলা থাকতেন...' কথাটা শেষ করতে পারল না আগন্তুক, দরজা আগলে দাঁড়ানো ভদ্রলোক বললেন- 'জ্বী, উনি কয়েকদিন আগে অন্য জায়েগায় বাসা ভাড়া নিয়েছেন।'

'আপনি কি তার ঠিকানাটা জানেন?' জানতে চাইল আগন্তুক।

'দুঃখিত, এই মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে রায়নগরের ওদিকে হবে হয়ত।'

'ধন্যবাদ...' বলে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক। তারপর হন্‌হন্ করে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেকুবের মত অবাক হয়ে লোকটার চলে যাওয়া দেখলেন বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক।

তারপর শ্রাগ করে দরজা লাগিয়ে দিলেন তিনি।

ফারিয়া একদৃষ্টিতে দেয়ালে ঠাঙানো 'শার্লক হোমস্‌রে' পোট্রেটটার দিকে তাকিয়ে আছে। আর ভাবছে চিত্রশিল্পী হাসান কি তবে তাকে মিথ্যে বলেছে? মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে ছবিটা বিক্রি করেছে তার কাছে? সে বলেছিল প্রতি অমাবস্যার রাতে এই ছবিটা নাকি জীবন্ত রূপ ধারণ করে। ছবি থেকে মাটিতে নেমে আসে জলজ্যান্ত শার্লক হোমস্! ব্যাপারটা নিতান্তই হাস্যকর আর অবাস্তব মনে হলেও ফারিয়া তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। ওর এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কোন যুক্তি নেই। যদিও ছবিটা সে কিনেছে নিতান্তই শখের বশে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে কেন জানি আপনা-আপনি ব্যাপারটা নিয়ে বেশ চিন্তিত ফারিয়া। এতদিন ওর মনে হয়েছিল শার্লক হোমস্ সত্যি সত্যিই জীবিত হবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এসব ফালতু চিন্তাধারার কোন মানে হয় না।

আজ অমাবস্যার রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে আছে গোটা পৃথিবী। আকাশের দিকে তাকালে সীমাহীন অন্ধকারে আকাশের অস্তিত্ব কোনকালে ছিল বলে মনেই হয় না। চারিদিকে নিপাট নিঝুম আঁধারীর মেলা।

চিত্রশিল্পী হাসানের কথা যদি সত্যি হত তবে এতক্ষণে শার্লক হোমস্ ছবি থেকে মানুষে পরিণত হত। কিন্তু রাত বারোটা বাজতে চলল, এসবের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সুতরাং, অবান্তর আগ্রহ নিয়ে অযথা রাত জাগার কোন মানে হয় না। তারচেয়ে জম্পেশ একটা ঘুমের প্রস্তুতি নিলে ভাল হয়। এই ভেবে ফারিয়া শার্লক হোমস্‌রে পোট্রেট থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ঠিক তখুনি কলিংবেলের শব্দটা স্পষ্ট কানে এল ওর। কিন্তু অবাক হল না। নিশ্চয়ই আবিদ এসেছে।

আবিদ ফারিয়ার স্বামী। স্পেশাল ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা। তাই বাসায় ফিরতে প্রায়ই এমন

www.pathagar.com

রাত হয়। মাঝেমধ্যে তো ফেরেই না।

আবিদ এসেছে ভেবে অবাক না হলেও দরজা খুলে ভীষণ অবাক হল ফারিয়া। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে হাসান। চিত্রশিল্পী হাসান। যার কাছ থেকে ফারিয়া শার্লকের ছবিটা কিনেছে।

'আরে হাসান সাহেব, আপনি!' ভদ্রলোককে ভেতরে ঢুকতে বলে জিজ্ঞেস করল ফারিয়া। হাসানের হন্তদন্ত ভাব তাকে বিস্মিত করেছে।

'জ্বী, আপনার বাসাটা খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট হয়েছে। আপনার পূর্বের বাসার বাড়িওয়ালার কাছে আজ একবার গিয়েছিলাম। তিনিই জানালেন আপনি এদিকটায় চলে এসেছেন।' কথাগুলো বলতে বলতে ভিতরে ঢুকল হাসান। তাকে নিয়ে সিটিং রুমে বসল ফারিয়া। জানতে চাইল কি এমন ব্যাপার ঘটেছে যে হাসানকে এতরাতে ওর বাসায় আসতে হল?

ফারিয়ার ইতস্তত ভাব দেখে হাসল হাসান। বলল, 'আরে এতটা উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি আসলে এসেছি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে।'

'মানে?' ভ্রু কুঁচকালো ফারিয়া।

'মানে ওই শার্লক হোমসের ছবিটা। ওটা যে অমাবস্যায় জীবিত হয়ে ওঠে তা প্রমাণ করতেই আমি এসেছি।' বলে হাতঘড়িতে নজর বুলাল হাসান। 'যান, ছবিটা এখানে নিয়ে আসুন। বারোটা বাজতে আর মাত্র তিন মিনিট বাকি। যান, তাড়াতাড়ি...,' প্রায় জোর করেই ফারিয়াকে পাঠাল হাসান।

নিজের বেডরুমের দিকে রওনা হল ফারিয়া। হাসানের এমন উদ্ভট আচরণ ওকে অবাক করেছে। একটা লোক স্রেফ নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এতকষ্ট করে ওদের বাসা খুঁজে এসেছে। তাও এতরাতে! ব্যাপারটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ব্যাটার কোন কুমতলব নেই তো?

'না, আমাকে প্রথমে আবিদের কাছে ফোন করতে হবে।' মনে মনে ভাবল ফারিয়া। বেডরুমে না ঢুকে করিডোর কর্ডলেস থেকে স্বামীর সাথে যোগাযোগ করল ও। আবিদ জানাল পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে আসছে। ফোন রেখে বেডরুমে ঢুকল ফারিয়া। পরক্ষণেই হতভম্ব হয়ে পড়ল ও। অবিশ্বাস্য চোখে দেখলো শার্লক হোমসের ছবিতে হোমস্ নেই, আছে ওর চাপটা, তাহলে কি...!

'মিষ্টার হাসান,' হুড়মুড় করে সিটিং রুমে ঢুকল ফারিয়া। ওর হাতে শার্লকহীন পোর্ট্রেট। 'মিষ্টার হাসান, অবাক কান্ড দেখুন তো...' পরক্ষণেই থমকে দাঁড়াল ও। সিটিং রুমের চারপাশে নজর ফেলল। চিত্রশিল্পী হাসানের চিহ্নই নেই ঘরে! হাসানের নাম ধরে বার কয়েক হাঁক ছাড়ল ফারিয়া। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বাইরে বেরুনোর দরজাও বন্ধ। তাহলে লোকটা গেলো কোথায়? নিশ্চয়ই ঘরের কোথাও আছে। বাথরুমে যায়নি তো? হাতের পোর্ট্রেট সোফায় আলগোছে রাখল ফারিয়া। অজানা আশঙ্কায় বুকটা এখন কাঁপছে ওর। হাসানকে এখন সত্যি সত্যি বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।

বাথরুমের দিকে এগোচ্ছিল ফারিয়া। ঠিক তখুনী কলিংবেলটা বেজে উঠল বিকট শব্দে।

www.pathagar.com

আঁৎকে উঠল ও। নজর আপনা-আপনি চলে গেল শার্লক হোমসের পোট্রেটের ওপর। পরমুহূর্তেই ভীষণ বিস্ময় আর চমকে শিহরিত হল ওর শরীর। প্রচন্ড হতবিহব্বল দৃষ্টিতে ফারিয়া চেয়ে দেখলো পোট্রেটে হোমসের ছবি ফিরে এসেছে! আগের মতই ফুটে উঠেছে ছবিটা। কিন্তু ব্যতিক্রম কেবল একটি জায়গায়..., হোমসের চেহারায়! ফারিয়া স্পষ্ট দেখল চিত্রশিল্পী হাসানের মুখায়বয়ব ফুটে উঠেছে পোট্রেটে! স্পষ্টতর থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে শার্লক হোমস্ ওরফে হাসানের আকৃতি! ভয়-আতঙ্ক জায়গায় গ্রাস করল ফারিয়াকে। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে ও। তীব্র ত্রাসের মধ্যে ও বুঝতে পারল কিছুক্ষণ আগের হাসান আসলে সত্যিকারের হাসান নয়, ছিল সত্যিকার শার্লক হোমসের প্রতিকৃতি! এরমানে সত্যিই কি জীবন্ত হয়েছিল হোমস্ প্রতিকৃতি?

জ্ঞান হারানোর ঠিক আগ মুহূর্তে ফারিয়া শুনতে পেল কলিংবেলের তীক্ষ্ণ শব্দ এবং একই সাথে ওর স্বামীর কণ্ঠ। আবিদ চেঁচিয়ে ডাকছে- 'ফারিয়া, দরজা খোল...।'

www.pathagar.com

অলৌকিক প্রহর

শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে হঠাৎ স্কুল বন্ধ হয়ে গেল হপ্তা খানেকের জন্য। বিনানোটিশে আচমকা এরকম ঘটায় ভীষণ বিরক্তিবোধ করলাম। কিন্তু তা উবে গেল তখুনি, যখন শুনলাম বাবা তাঁর এক গবেষণামূলক কাজের জন্য মা আর আমাকে নিয়ে সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে যাবেন।

একটি ভাল দিন দেখে ক্যাব ভাড়া করে আমরা সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সারাদিন জার্নি শেষে সিলেটে পৌঁছুলাম সন্ধ্যের পরপর। লোকালয় ছেড়ে কিছু দূরের একটি চা-বাগান সম্মৃদ্ধ পাহাড়ী এলাকায় কাঠের তৈরি একটি বাংলো ভাড়া করে ওখানে সপরিবারে উঠলাম আমরা সবাই।

রাতটা ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে সকালে জেগে উঠে দেখি- আমাদের বাংলোর চারপাশে চা-বাগানের সমারোহ। আর সেই মিষ্টি সবুজের সমারোহ ছাড়িয়ে সেগুনগাছে ঢাকা ছোটবড় পাহাড়।

বাংলোটি তিনরূমের। সামনে এবং পেছনে বারান্দা আছে। আমি পেছনের বারান্দার সাথে লাগোয়া রূমটা থাকার জন্য নিয়েছি। পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের কয়েকটা পাহাড়ের পাদদেশে ছোট-ছোট অনেকগুলো কুঁড়ে ঘর নজরে পড়ে।

আমি ঠিক করলাম, আজ বিকেলে ওদিকটায় একটু ঘুরে আসব। চারপাশের পরিবেশটা কাছ থেকে দেখব।

দুপুরে খাবার সময় পরিকল্পনার কথা পাড়তেই বাদ সাধলেন বাবা। বললেন, 'নতুন জায়গা, একা-একা ঘুরে বেড়াতে যেও না।'

'তাহলে একজন গাইডের ব্যবস্থা করে দাও,' বললাম আমি।

'গাইডের প্রয়োজন নেই। দু'দিন সবুর করো। আমি হাতের কাজটা সেরে নেই, ব্যস্ততা কমে গেলে আমিই তোমাকে তোমার ইচ্ছে মতো ঘুরে দেখাতে পারব সিলেটের এই পাহাড়ী অঞ্চলটা।'

মা'ও বাবার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললেন, 'সেটাই ভাল হবে হ্যারি। অচেনা জায়গায় একা একা বেড়ানোটা ঠিক হবে না, কখন কি বিপদ ঘটে বলা যায় না।'

আমি আর কিছু বললাম না, বাবা-মা'র কথাই মেনে নিলাম বাধ্য ছেলের মত।

রাত প্রায় দশটা, খাবারের পাঠ চুকিয়ে নিজের রূমে এসেছি। আমার রূমের আসবাবপত্র বলতে যা আছে তা হল- একটি খাট, চেয়ার-টেবিল, আলনা আর একটি সাদাকালো টিভি। টেবিলের ওপর সঙ্গে আনা বইগুলো সাজিয়ে রেখেছি। যতগুলো বই এনেছি তা এই ছুটি কাটিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

www.pathagar.com

টেবিল থেকে একটি বই তুলে নিয়ে পেছনের বারান্দায় এসে বসলাম। রাতের আঁধারে সামনের পাহাড় জেগে আছে কালোছায়ার মতো। সেই কালোছায়ার তলদেশ জুড়ে ছড়ানো কুঁড়ে ঘরগুলো থেকে ছড়িয়ে পড়েছে মিটিমিটি আলোক তরঙ্গ। ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বারান্দার লাইটের আলোতে বইটি চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

কিছুক্ষণ পর আম্মু এলেন। আমাকে বই পড়তে দেখে মনে হয় অবাকই হলে। বললেন,'কিরে হ্যারি, ঘুমোবি না?'

আমি আড়মোড়া ভেঙে হেসে জবাব দিলাম,'না আম্মু, ঘুম আসছে না।'

'শুয়ে পড়গে, দেখবি ঘুম এসে যাবে।'

'কিন্তু রাতের পাহাড়ী পরিবেশ ভালই ফিল করছি আম্মু।' অনুনয়ের সুরে বললাম।

আম্মু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মুচকি হেসে বললেন,'ঠিক আছে, আরো কিছুক্ষণ না হয় কাটা বারান্দায়...' বলে আম্মু চলে গেলেন।

আরো ঘন্টাখানেক বই পড়ার পর আমিও উঠে পড়লাম। আমার রুমে ঢুকে বইটা যথাস্থানে রেখে বিছানায় উঠে বেড সুইচ টিপে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলাম। তারপর শুয়ে শুয়ে বাবা-মা'র কথা ভাবতে লাগলাম। আমাকে তাঁরা কত আদর করেন, আমি তাদের একমাত্র সন্তান বলে। আমিও চাই, কখনো যেন তাঁদের অবাধ্য না হই।...

বেশিক্ষণ ভাবতে পারলাম না, হঠাৎ তন্দ্রায় জড়িয়ে এল দু'চোখ। হারিয়ে গেলাম ঘুমের জগতে।

পরদিন সকালে কারো ডাকে ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখি, আমার সামনে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে নরম কণ্ঠে বললেন,'জেসান, উঠে পড়। ব্রেকফাস্ট খাবে না?'

জিসান! আমার নাম জিসান হল কবে থেকে? আর এই ভদ্রমহিলাই বা কে?

চারিদিকে চোখ বুলালাম। কিন্তু একী!

আমার কাপড়-চোপড়, বইপত্র, কোথায় গেল সব? আমার কাপড়-চোপড়ের জায়গায় অন্য কাপড়-চোপড়, আমার বইয়ের জায়গায় একটি ক্যাসেট প্লেয়ার। কার ওগুলো? এ ঘরের কোন জিনিসপত্রই আমার নয়, অথচ আমার স্পষ্ট মনে আছে এই ঘরেই কাল রাতে আমি শুয়েছিলাম। আমার অবস্থা দেখেই সম্ভবত ভদ্রমহিলা অবাক হলেন। বললেন,'জিসান, তোমার কী হয়েছে? এমন করছো কেন?'

আমি দ্রুত বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লাম। বললাম,'আপনি কাকে জিসান বলছেন? আমার নাম হ্যারি!'

'তুমি কি ঠাট্টা করছো আমার সাথে?' টিটকারীর স্বরে বললেন ভদ্রমহিলা।

'আমি ঠাট্টা করছি না আপনার সাথে। আপনি কে? কী করছেন এখানে? আমার বাবা-মা কোথায়?'

'দেখ জিসান, সাত সকালে এরকম হেঁয়ালী ভাল নয়। শরীর খারাপ করলে তা আমাকে বলো।' বলে আমার কাছে এসে কপালে হাত রাখলেন ভদ্রমহিলা। 'দেখি তো, জ্বর-টর হল কিনা!'

www.pathagar.com

আমার কপাল থেকে উনার হাত সরিয়ে বিরক্তির সুরে বললাম,'দেখুন, আমি আপনার সঙ্গে কোনো হেঁয়ালী করছি না। আমি হ্যারি, হ্যারি মুসা। আমার বাবার নাম মুসা খন্দকার, তাঁরা কোথায়?'

ভদ্রমহিলা সম্ভবত রেগে গেলেন। বললেন,'দেখ জিসান, তুমি হেঁয়ালি করতে গিয়ে নিজের মায়ের সাথে কী রকম ব্যবহার করতে হয় ভুলে যেও না!'

মা! এই ভদ্রমহিলা আমার মা? অসম্ভব! আমার আম্মুর চেহারা কখনই এই ভদ্রমহিলার মতো নয়।

উফ্! এ আমার চোখের সামনে ঘটছেটা কি? নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি? ...উঁহ্ ! আমি তো জেগেই আছি। তাহলে...!

'জিসান, আমি কিন্তু তোমার বাবাকে ডাকতে বাধ্য হবো। আর তুমি ভাল করেই জান, তোমার এরকম আচরণে কতটা মাইন্ড করবেন তোমার বাবা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! উনাকে ডাকুন। আমি উনার সাথে কথা বলতে চাই!' ঝাঁঝালো কণ্ঠে চেঁচালাম আমি। আমার মুখে এরকম কথা শুনে হাঁ হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। এই ফাঁকে আমি রুম ছেড়ে বেরিয়ে এলাম সামনের বারান্দায়।

হ্যাঁ, সবকিছুই ঠিক আছে। গতকালের বাংলোর চা-বাগান থেকে শুরু করে কাঁটাতারের বেড়া, গেট, বাগানের একদিকের দোলনা, রেস্টটিং চেয়ার-টেবিল সবই ঠিক আছে। কিন্তু রেস্টিং চেয়ারে বসে যিনি পেপার পড়ছেন- ভদ্রলোকটি কে?

'পিটার, তাড়াতাড়ি এদিকে এসো। জিসান কী শুরু করেছে, দেখে যাও!' হঠাৎ আমার কথিত মা'র চিৎকার- চেঁচামেচি শুনে চমকে উঠলাম আমি। তখুনি লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক নিউজ পেপার রেখে রেস্টিং চেয়ার থেকে উঠে আসছেন। এদিকে আমার কথিত মা এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পেছনে। ভদ্রলোক এগিয়ে আসতে তিনি বললেন,'পিটার, তোমার গুণধর পুত্রের (!) কী হয়েছে দেখ তো!'

পিটার নামের এই ভদ্রলোকই তাহলে এখন আমার পিতা'র ভূমিকায়! হায় আল্লাহ্! আরো কি দেখতে হবে কে জানে!

সন্ধিহান চোখে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন মি.পিটার। বললেন,'জিসান, কী হয়েছে তোমার?'

'আগে বলুন, আপনি কে?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমি কে মানে? কী বলতে চাও তুমি, জিসান? আমি তোমার বাবা, পিটার।' হাত নাড়লেন ভদ্রলোক।

'মিস্টার পিটার, কোথায়ও কিছু গোলমাল আছে। আমি আপনাদের ছেলে নই!'

'তাই নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কথাই না হয় সত্যি। কিন্তু ঘরে যে তোমার বাঁধানো ফটোগ্রাফ রয়েছে, সেই ফটোগ্রাফের চেহারা আর তোমার চেহারা যে এক, তা কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে?'

বুঝতে পারছি, আমার চেহারা হয়তো তাঁদের জিসানের মত দেখতে। বুঝেছি, অন্য পথ ধরতে হবে।... আচ্ছা, আমি ছাড়া ওরা না হয় জানলেনই যে আমিই তাদের ছেলে জিসান। কিন্তু আমার মা-বাবা কোথায়? আর আমার জিনিসপত্রই বা কোথায়?

www.pathagar.com

হঠাৎ আমার কথিত বাবার হাসির শব্দে চমকে উঠলাম আমি। 'হাঃ হাঃ হাঃ! যাও জিসান, হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা খেতে এসো। তোমার মাকে ধোঁকা দিলেও আমাকে কিন্তু দিতে পারবে না।'

ধ্যেত্তেরি! এদের কিছুতেই কিছু বোঝানো যাবে না। তারচেয়ে বরং এঁদের জিসান সেজেই এই রহস্যের কিনারা বের করব আমি। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার কথিত বাবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমিও হেসে ফেললাম। বললাম,'সত্যিই বাবা, তুমি খুবই চালাক। আজও তোমাকে হারাতে পারলাম না!'

কথাটা শুনে 'মায়ের' মুখে স্বস্তির হাসি ফুটল। 'বাবা' আমাকে চাপড় মেরে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তখন মা বললেন,'আমাকে তুমি ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলে জিসান। যাও, মুখ ধুয়ে এসো। আমি নাস্তা রেডি করছি।'

'যাচ্ছি,' বলে মাথা নেড়ে সায় জানালাম আমি। ট্রিউবওয়েল থেকে মুখে ধুয়ে এসে ক্রিম মাখার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। কিন্তু একি! আয়নার মধ্যে এ আমি কাকে দেখছি? এত আমার চেহারা নয়, তাহলে? কেমন এক আতঙ্কের স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাড় বেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা বন্‌বন্‌ করে উঠল। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম আমি। 'ধপাস!' করে শব্দ হল কাঠের ফ্লোরে...। এরপর কি হল মনে নেই।

জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে নিজের বিছানায় আবিস্কার করলাম আমি। ভেবেছিলাম আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। নিজের আসল আব্বু-আম্মুকে চোখ মেললেই দেখতে পাব। কিন্তু তা আর হল না। জিসানের বাবা-মাকেই নজরে পড়ল। দু'জনেই উদ্বিগ্নভাবে বসে আছেন আমার বিছানার পাশে। আর বাবুর্চি ও পোর্টার মহিলা ওরা দু'জনেও দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে আমার কথিত 'বাবা-মা' বলে উঠলেন,'তুমি ঠিক আছো তো, বাবা?'

'হ্যাঁ মা, আমি ঠিক আছি।' আমি কথিত মায়ের দিকে তাকিয়ে দুর্বল হেসে বললাম।

'ঠিক আছে জিসান, তুমি শুয়ে থাক। এখন তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।' বলে উঠে দাঁড়ালেন বাবা।

মা বললেন,'তোমার কিছুর প্রয়োজন হলে আমাদের ডেকো জিসান।' কথাটা বলে তিনিও উঠলেন। তারপর একে একে সবাই চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, আমার কী হয়েছিল, কেউ তা জিজ্ঞেস করেননি। হয়ত উত্তেজনায় জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছেন ওরা। যাক! বাঁচা গেল।

বেশ কিছুক্ষণ আমি শূন্যঘরে শুয়ে রইলাম। ব্যাপারটা সত্যিই গোলমেলে। কিন্তু এই রহস্য আমি উদঘাটন করে ছাড়বই। তবে সবার আগে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে আমার আসল বাবা-মাকে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেই কুঁড়ে ঘরগুলোর কথা। মনে হল, ওখানকার মানুষজন হয়ত আমাকে কোন তথ্য দিতে পারবে এ ব্যাপারে।

দ্রুত বিছানা থেকে নেমে পেছনের বারান্দায় চলে এলাম আমি। তাকালাম পাহাড়গুলোর পাদদেশের কুঁড়ে ঘরগুলোর দিকে। হ্যাঁ, আছে ওগুলো জায়গা মতো।

www.pathagar.com

আবার রুমে ঢুকে রাতের কাপড়-চোপড়গুলো পাল্টিয়ে পরে নিলাম জিসানের নতুন পোশাক। ওর কাপড়গুলো ভালভাবেই ফিট হয়েছে আমার শরীরে।

সবার আগোচরে পিছন দিক দিয়ে বাংলো থেকে গোপনে বেরিয়ে পড়লাম আমি। ঝোঁপঝাড়ের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে নেমে এলাম টিলার নিচে।

নিচে নেমে উপরে বাংলোর দিকে তাকালাম। ঢাকা থেকে এখানে এসে বাংলোটাকে যেরকম আবিস্কার করেছিলাম, ওটা হুবহু সেরকমই আছে। কিন্তু...?

আরে! ওই ছেলেটা কে? আয়নায় নিজের যে চেহারা দেখেছি হুবহু সেই চেহারা!

বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে!

তাহলে এই কি আসল জিসান?

ভুরু কুঁচকে ভাল করে ওর দিকে তাকালাম আমি। ডান হাত তুলে 'টা-টা'র মতো করে হাতটা নেড়ে ভেতরে চলে গেল আসল জিসান।

যাকগে, ওর কথা পরে ভাবা যাবে। আগে আমি আমার উদ্দেশ্য হাসিল করি! এই ভেবে পাহাড়ী ট্রেইল ধরে হাঁটতে লাগলাম। এই প্রথম ভাল করে এলাকাটা দেখার সুযোগ হল। তবে আমি সবকিছু কৃত্রিম না অকৃত্রিম উপায়ে দেখছি, তা আল্লাহ্ই মালুম!

মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর কিছুদূরে তিনটি তিন রকম ছেলের উপর নজর পড়ল আমার। মনে মনে হেসে উঠলাম ওদের দেখে। একটি ছেলে তো তালগাছের মত লম্বা, আরেকটাকে দেখে আমার মনে পড়ে গেল ফুটবলের কথা। অন্য ছেলেটা বেঁটে টাইপের। তিনজনেই একটি গাছের ছায়ায় বসে গল্প করছিল। আমাকে দেখে তালগাছ উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে এল আমার দিকে। কটমট করে তাকাল আমার চোখে, যেন পারলে চিবিয়ে খায়। জোর করে হাসার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে খপ্ করে আমার শার্টের কলার চেপে ধরল ছেলেটা। আমি থমথম খেয়ে শান্ত কণ্ঠে বললাম,'এটা...এটা কীরকম ব্যবহার?'

তালগাছ আমার কলারটা আরও চেপে ধরে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠল। বলল,'হারামজাদা উল্লুক! সেদিন আমাকে একা পেয়ে মেরেছিলি মনে নেই? আজ আমি তোকে... হ্যাঁ, আজ আমার পালা। তৈরি হয়ে নে।' বলে কলার ছেড়ে দিল তালগাছ।

'আমি তোমাকে মারিনি!' মনে মনে বললাম। 'তবে কে মেরেছে তা বেশ বুঝতে পারছি। জিসান!' কিন্তু মুখে দৃঢ় কণ্ঠে বললাম,'দেখ, আমি একা। তোমরা তিনজন। পারলে তুমি একা আসো, হয়ে যাবে একহাত!'

'কিন্তু তুই তো দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে মেরেছিলে।' তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল তালগাছ।

'আমি না হয় কাপুরুষ ছিলাম, তাই বলে তুমিও আমার মত হবে নাকি?'

'অবশ্যই!' বলেই আমাকে লক্ষ্য করে লাথি মারল তালগাছ। ডান হাত দিয়ে আক্রমণ ঠেকালাম আমি। তারপর ডিগবাজি খেয়ে বেশ কয়েক গজ দূরে গিয়ে নিজের পজিশনে দাঁড়ালাম। এবার আমি যেকোন আক্রমণ ঠেকাতে প্রস্তুত।

আমার পজিশন দেখে কিছুটা অবাক হয়েছে বলে মনে হল লম্বুকে। হয়ত জিসান এরকম

www.pathagar.com

ছিল না বলে। বাকি দু'জনও উঠে দাঁড়াল। একজন আবার পকেট থেকে একটি ছুরিও বের করল। ওটা দেখে কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম আমি। তবে নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে তালগাছকে টার্গেট করে দৌড়ে গিয়ে একটি ফ্লাইং কিক্ বসিয়ে দিলাম ওর পেট বরাবর। তারপর দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে সুযোগ বুঝে অন্য দু'জনের উপরে ঝাড়তে লাগলাম পাইকারী হারে বেদম লাথি ঘুষি। কিন্তু ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম হঠাৎ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে সুযোগটা কাজে লাগাল ওরা। ছুরিধারী ফুটবল মার্কা ছোকড়াটা সোজা এসে চড়ে বসল আমার উপর। বাকি দু'জন আমার হাত পা চেপে ধরল। আর কয়েক সেকেন্ড পর আমার অবস্থা কী হবে ভেবে শিউরে উঠলাম আমি। এদিকে ফুটবলের প্রচন্ড ভারেই আমার দম ফুরিয়ে যাওয়ার জোগাড়! ঠিক তখুনি ফুটবল আমার হৃৎপিন্ড বরাবর ছুরিটা শূন্যে তুলে ধরল। তারপর সাঁই করে নামিয়ে আনল নিচে!

কিছু একটার ছোঁয়া অনুভব করলাম প্রথমে। তারপর স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ছুরিটার তীক্ষ্ম ধারাল ফলা গেঁথে গেছে আমার বুকের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে বিকট চিৎকার করলাম আমি। আমার আর্তনাদে যেন কেঁপে উঠল প্রকৃতি।

'না-আ!' ভয়ঙ্কর এক আর্তচিৎকার দিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম আমি। বাংলোয় নিজের সেই রুমে আবিস্কার করলাম নিজেকে। পাশের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন আমার আসল বাবা-মা। বাবা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,'কী হয়েছে হ্যারি?'

মা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন,'কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছিস, বাবা?'

আমি বাবার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বুকে হাত দিলাম। নাহ্, সবকিছু ঠিক আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ আছি আমি। বাবা-মা'র প্রশ্ন এড়িয়ে আমি উল্টো জানতে চাইলাম,'এখন ক'টা বাজে?'

বাবা তার হাত ঘড়ির আলো জ্বালিয়ে সময় দেখলেন। বললেন,'রাত সাড়ে তিনটা বাজে। কেন?'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। এই ফাঁকে আম্মু ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন। সম্পূর্ণ ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল। আমি বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম,'আচ্ছা বাবা, তুমি যে আমাকে এখানে একা-একা বেড়াতে বেরোতে নিষেধ করেছো, তার কারণটা আমাকে বলবে কি?'

'কারণটা খুবই বেদনাদায়ক বাবা। এখানে এসেই আমি শুনেছি, আমাদের আগে এখানে একটি খ্রিস্টান পরিবার এসেছিল। ঐ পরিবারে তোর মতো একটি ছেলেও ছিল। সেই

www.pathagar.com

ছেলেটি...' বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন বাবা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম,'কী হয়েছিল সেই ছেলেটির, বল বাবা!'

'এখানকার কয়েকটা বখাটে ছেলের সাথে একদিন সেই ছেলের মারামারি লেগে যায়। দুর্ঘটনাক্রমে দলের একটি ছেলে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। ফলে সে মারা যায়।'

'তারপর?' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম আমি। কারণ এরপরে আমার কিছু জানা নেই!

'তারপর আর কি? পুলিশ কেস হল। ছেলেগুলো ধরা পড়ল।'

'আর ছেলেটার বাবা-মা'র কী হল?'

'আর কী হবে? যেখানে থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেলো ওরা ছেলেটার লাশ নিয়ে। শুনেছি, একমাত্র ছেলের অকাল মৃত্যুর শোক সইতে না পেরে ছেলেটার বাবা-মা দু'জনেই নাকি কয়েক দিন আগে মারা গেছেন!'

বাবার কথা শেষ হবার পর পুরো ঘরটায় পিনপতন নীরবতা নেমে এল। বাবা-মা দু'জনেই চুপ। মা'র চোখে পানি। আমার কথা যেন ভুলেই গেছেন তাঁরা।

সর্বশেষ একটি প্রশ্নে আবারো নীরবতা ভাঙলাম আমি, 'ছেলেটার নাম কী ছিল বাবা?'

একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাবা জবাব দিলেন, 'জিসান!'

---

www.pathagar.com

২০০১ সালের মে মাসে মাসিক 'আদর্শ রমনী'তে যখন আমার সর্বপ্রথম রচনাটি প্রকাশিত হল তখন আমার আনন্দের সীমা ছিল না। লেখাটি ছিল একটা ছোটগল্প, তবে সত্য ঘটনা অবলম্বনে। পত্রিকা স্টলে দাঁড়িয়ে লেখাটি আবিস্কারের পর কিভাবে বাসায় এসেছিলাম মনে নেই। ছাপার অক্ষরে নিজের লেখাটি দেখে প্রচন্ড হৈচৈ করে পুরো বাসা মাথায় তুলেছিলাম। ব্যস্, লেখালেখিটা সেই থেকেই শুরু হল। বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে কলমটাকে বেশ শক্ত করেই পাকড়াও করলাম। 'নাফে মোহাম্মদ এনাম'র জায়গায় 'নাফে মোহাম্মদ এশা' ছদ্মনাম নিয়ে লেখালেখিটা যাত্রা শুরু করল একচেটিয়া ভাবে। দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রপত্রিকায় লিখে আত্মপ্রকাশের সুযোগটা পেয়ে গেলাম। পাশাপাশি স্থানীয় ও আঞ্চলিক কিছু ছোটকাগজে লিখে নিজেও প্রকাশ করেছিলাম চার-পাঁচটি ছোটকাগজ। ইতিমধ্যে নিজস্ব রচনা, চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও প্রযোজনায় 'ঘটনার অন্তরালে' নামে একটি নাটক নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু আপাতত কাজটা বন্ধ রেখেছি প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার জন্য। তবে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করে যাচ্ছি কিছু গানের কথা ও সুর। আর পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি কখনই ভাল ছাত্র ছিলাম না। লেখালেখির ভূতটা ঘাড়ে চেপে বসতেই পড়াশোনার প্রতি আমার তীব্র অমনোযোগীতা ও অলসতা সৃষ্টি হয়। ফলে পড়াশোনার পাঠ অনেক আগেই শিঁকেয় তুলেছি। এখন ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার বলতে একটাই স্বপ্ন দেখি- একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক ও সুনামধন্য নাট্যকার হব। কতটুকু সফলতা পাব যেটা মহান আল্লাহতালাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে। বাকিটা নির্ভর করছে পাঠকদের ওপর। মোটকথা, এসব নিয়েই আমি এনাম, মোহাম্মদ এনামুল হক এনাম- শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাই থাকব। বেঁচে থাকব ঠিকই, কিন্তু বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। ধন্যবাদ।।

www.pathagar.com

প্রচ্ছদ ঃ ইয়াহ্ইয়া ফজল

ALOIKEK PROHOR

by Nafee Muhammad Anam

Price: 30.00 Only

USA: 5 Doller UK: 4 Paund

Printing by:

Sign co Add

Zindabazar, Sylhet